Vol. 44 | No. 1 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাংবাদিকতায় নজরুল

Volume	44
Issue	1
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মফিজুর রহমান
Published online	October 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v44i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i1.3
Pages	৩১-৪৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাংবাদিকতায় নজরুল

মফিজুর রহমান*

বৈচিত্র্যময় প্রবণতায় পরিপূর্ণ কবি নজরুলের জীবন সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, সাংবাদিক, সৈনিক, রাজনীতিক ইত্যাদি ভূমিকার মধ্য দিয়ে তিনি কখনো হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহী, কখনো বিপ্লবী, কখনো বা সাম্যবাদী। কবি জীবনের সবচেয়ে কম আলোচিত অধ্যায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের ওপর আলোকপাত করাই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় কখনো সম্পাদক, কখনো পরিচালক, কখনো বা শুধু লেখক সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯২০ সালে মূলত সম্পাদক হিসেবেই নজরুলের সাংবাদিক জীবনের সূচনা। সংবাদপত্র জগতে একেবারে নবীন হিসাবে তিনি সান্ধ্য দৈনিক *নবযুগ*-এ কাজ করা শুরু করেন। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই থেকে এ পত্রিকা প্রকাশিত হয় (রয়াল সাইজ ২০″x২৬″)। এর প্রকাশক ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক আর প্রকাশকের ঠিকানা ছিল ৬নং টার্নার স্ট্রীটের বাড়ির নিচতলা। তিনি কীভাবে সাংবাদিকতায় এলেন তা একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র তিনি ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টে যোগদান করেন ১৯১৭ সালে। সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থায় তাঁর সাথে তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সম্পাদক ও ম্যানেজার মুজফ্ফর আহ্‌মদের চিঠিপত্রের মাধ্যমে পরিচয় হয়। *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার* ১৯১৯ সালের জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' মুজফ্ফর আহ্‌মদই ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মুজফ্ফর আহ্‌মদের বিপ্লবী ও সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা তরুণ কবিকে প্রভাবিত করে। ফলে সাংবাদিক নজরুলের আবির্ভাব ঘটে। বিশ্বযুদ্ধ শেষে ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট পুরোপুরি ভেঙে গেলে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ও বিপ্লবী চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে। সে-সময় মুজফ্ফর আহ্‌মদের সঙ্গে মিলে একটি বাংলা দৈনিক প্রকাশই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। মুজফ্ফর আহ্‌মদ লিখেছেন :

> দু'-চার জনকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল ইসলাম আর আমি পরামর্শ করতে লাগলাম আমরা কিভাবে কাজে এগুব। এই পরামর্শে মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী ছিলেন। এই ওয়াজিদ আলী সাহেব একজন লেখক ও

---

* সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> সাংবাদিক ছিলেন, কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াজিদ আলী সাহেবের সঙ্গে কেউ যেন তাঁকে ভুল না করেন। ফজলুল হক সেলবর্সী ও মঈনুদ্দিন হুসায়ন সাহেবও আমাদের পরামর্শে ছিলেন। ফজলুল হক সেলবর্সী সিলেট জেলার লোক, খবরের কাগজে লিখতেন। ... আমরা ঠিক করলাম যেমন করেই হোক একখানা ছোট্ট বাঙলা দৈনিক আমরা বের করব। এই কাগজের লেখার ভিতর দিয়ে আমাদের মত ও পথ নিরূপিত হয়ে যাবে।
>
> কিন্তু কাগজ তো বের করব, তার টাকা আসবে কোথা হতে ? প্রথম মহাযুদ্ধের পর একদিকে যেমন লোকের বিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল, অন্যদিকে আবার মুনাফাকারীরা নূতন নূতন জয়ন্ট স্টক্ কোম্পানীও রেজিস্ট্রি করছিলেন। আমরা ভাবলাম টাকা সংগ্রহের জন্যে ওই রকম একটা কিছু করা যায় কিনা। পরামর্শের জন্য মিস্টার এ.কে. ফজলুল হকের নিকটে যাওয়া স্থির হলো। মিস্টার আবুল কাসেম ফজলুল হক তখন কলকাতা হাইকোর্টের নামজাদা উকীল, আজকার ভাষায় এডভোকেট ছিলেন। তা ছাড়া, তিনি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের যুক্ত নেতাও ছিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদিন সকালে আমরা ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর নিকটে কথা তুলতেই তিনি বললেন, তাঁর একটা প্রেস আছে, কিছু টাকাও আছে,— আমাদের যদি কাগজ চালাবার সাহস থাকে তবে সব ব্যবস্থা তিনি করে দিতে পারেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলাম।[১]

এভাবে *নবযুগ* (জুলাই ১৯২০) প্রকাশের মধ্য দিয়ে কাজী নজরুলের সাংবাদিকতা জীবনের সূত্রপাত হয়। *নবযুগ* ছাড়া পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অর্ধ-সাপ্তাহিকে সাংবাদিকতা করেছেন। এগুলোর মধ্যে দৈনিক *সেবক*, দৈনিক *মোহাম্মদী পত্রিকা*, *ধূমকেতু*, *লাঙ্গল*, *গণবাণী*, *নওরোজ*, *সওগাত* ও নবপর্যায়ের *নবযুগ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *নবযুগ* পত্রিকার মালিক ছিলেন এ কে ফজলুল হক, যুগ্মভাবে সম্পাদক ছিলেন তিনি ও মুজফ্ফর আহ্মদ। সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি *নবযুগের* জন্য সম্পাদকীয় লিখতেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ *যুগবাণী* তাঁর সাংবাদিকতা জীবনেরই ফসল। এ গ্রন্থে *নবযুগ*-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের অনেকগুলোই সংকলিত হয়েছে। ১৩৬৪ বাংলা সনে স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত *যুগবাণী* গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশক বলেন :

> ১৯২২ সাল আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক যুগ সন্ধিক্ষণ। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক সরকারের শোষণ ও অত্যাচারে দেশ তখন জর্জরিত, অন্যদিকে দেশবাসী অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এই অন্যায়, অবিচার, ভীরুতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। দৈনিক নবযুগের সম্পাদকীয় স্তম্ভে অনেক জ্বালাময়ী ও আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি লেখেন। তারই কতকগুলো নিয়ে এ পুস্তক প্রকাশিত হয়।[২]

মূলত তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তপ্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। উপমহাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ ১৯০০ থেকে ১৯৪৭— কালটাই ছিল রাজনৈতিক ঘটনায় পরিপূর্ণ যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোয়। এ

সকল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯১৭), মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট (১৯১৮), অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯), খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪), সর্বোপরি জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সে সব ঘটনার প্রতিফলন তাঁর সম্পাদনায় ১৯২০ সালের ১২ জুলাই প্রকাশিত সান্ধ্য দৈনিক *নবযুগে* দেখা গেলে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মত সংবাদ সংক্ষিপ্তকরণ ও শিরোনাম লিখনের কাজ তিনি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। এ প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহ্‌মদ *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> নিশ্চয়ই নজরুলের জোরালো লেখার গুণে প্রথম দিনেই কাগজ জনপ্রিয়তা লাভ করল। হিন্দু-মুসলমান দু'জনাই কাগজ কিনলেন। ফজলুল হক সাহেবের মেশিন খোঁড়া ছিল বলে আমরা চাহিদা মেটাতে পারলাম না। রয়েল সাইজের এক শীট্ কাগজের দাম করা হয়েছিল এক পয়সা। কাগজে নজরুল ইসলাম ও আমার নাম ছাপা হতো না। প্রধান পরিচালক হিসাবে এ.কে. ফজলুল হকের নাম ছাপা হতো। দৈনিক কাগজে লেখার অভিজ্ঞতা আমাদের ভিতরে একজনেরও ছিল না। নজরুল ইসলাম কোন দিন কোন দৈনিক কাগজের অফিসেও ঢোকেনি। তবু সে বড় বড় সংবাদগুলো পড়ে সেগুলোকে খুব সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় লিখে ফেলতে লাগল। তা না হলে কাগজে সংবাদের স্থান হয় না। নজরুলকে বড় বড় সংবাদের সংক্ষেপণ করতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ঝানু সাংবাদিকরাও এ কৌশল আয়ত্ত করতে হিমশিম খেয়ে যান। তার পরে নজরুলের দেওয়া হেডিং-এর জন্যেও "নবযুগ" জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা তার পড়া ছিল। সেইসব কবিতার কিছু কিছু কথা উল্লেখ করেও সে হেডিং দিত। সে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়েনি। যেমন ইরাকের রাজা ফয়সলের কি একটা সংবাদকে উপলক্ষ করে সে হেডিং দিয়েছিল :
>
> আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
> পরাণ সখা ফয়সুল হে আমার।[৩]

সম্পাদক নজরুলের লেখার গাঁথুনি ছিল জোরালো এবং ভাষা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ, আবেগময় ও চরমভাবে ব্রিটিশবিরোধী যুক্তিতে শাণিত। *নবযুগে* প্রকাশিত তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : নবযুগ, ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ, ছুঁৎমার্গ, গেছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ, শ্যাম রাখি না কুল রাখি, ধর্মঘট, আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন ?, জাগরণী, কালা আদমিকে গুলি মারা, মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে ? ... ইত্যাদি। বিপ্লবী ভূমিকার জন্য এ পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে। তখনকার দিনে পত্রিকা বের করতে হলে চীফ প্রেসিডেন্সি মেজিস্ট্রেটের কোর্টে এক হাজার টাকা জামানত রেখে বের করতে হতো। কোন পত্রিকা সরকার বিরোধী কিছু প্রকাশ করলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হতো। নজরুলের উত্তেজনাপূর্ণ লেখার জন্য সরকার জামানত বাজেয়াপ্ত করলে *নবযুগ* সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কোন লেখার জন্য এবং কোন পরিস্থিতিতে *নবযুগের* জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুজফ্ফর আহ্‌মদ স্মৃতিকথায় বলেন :

> 'নবযুগের' গরম লেখার জন্যে পরে পরে দু'বার কিংবা তিন বার সরকার আমাদের সতর্ক করেছিল। শেষ সতর্ক করেছিল 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের জন্যে। প্রবন্ধটি নজরুল ইসলামের লেখা। আমার যতটা মনে পড়ে খিলাফৎ কমিটির একটি ইশ্‌তিহার ছাপানোকে উপলক্ষ করেই টাকাটা বাজেয়াফ্‌ৎ করা হয়েছিল। এই ইশ্‌তিহারখানা কিন্তু অন্যান্য কাগজেও ছাপা হয়েছিল, ছাপা হয়েছিল দৈনিক বসুমতীতেও। কিন্তু টাকাটা কেড়ে নেওয়া হলো 'নবযুগের'। আমার মনে হয় নজরুলের 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' লেখাটিই ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসহ্য বোধ হয়েছিল।[৪]

ডঃ রফিকুল ইসলামের লেখায়ও *নবযুগ*-এর জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার পেছনে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের দেওয়া যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন :

> খেলাফত কমিটির ঐ ইস্তেহার ছাপানোর অভিযোগে জামানত বাজেয়াপ্ত হলেও আসল কারণ ছিল নজরুলের ঐ প্রবন্ধটি (মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?)। নইলে অন্য পত্রিকায়ও ঐ ইস্তেহারটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন?[৫]

'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

> কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইবনা, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানের বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইবনা? মনুষ্যত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের, স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনও সহ্য করিতে পারে কি?[৬]

জামানতকৃত ১,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত হলে নিয়ম-মতে আরো দুই হাজার টাকা জামানত দিয়ে পত্রিকা বের করতে হতো। এতদিন *নবযুগ* যেহেতু ব্রিটিশ-বিরোধী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে, তাই অনেকেই এ.কে. ফজলুল হককে জামানতের টাকা প্রদান করে *নবযুগ* পুনরায় বের করার আহ্বান জানান। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন :

> জামিনের দু'হাজার টাকা জমা দিতে ফজলুল হক সাহেব খুবই গড়িমসি করছিলেন। হয়তো কাগজ আর চালানো উচিত কি না এই বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু টাকা জমা দেওয়ার জন্য তাঁর বন্ধুরা এত বেশী পীড়াপীড়ি করছিলেন যে তিনি মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলেন না। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস যে তাঁর নিকটে আর টাকাও ছিল না। এই ধারণা আমার মনে জন্মানোর কারণ ছিল এই যে শেষপর্যন্ত তিনি বিখ্যাত টব্যাকো মার্চেন্ট আবদুর রহীম বখ্‌শ্ ইলাহীর নামে একখানা চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। সেই চিঠি নিয়ে গিয়ে আমি দু'হাজার টাকার একখানা বেয়ারার চেক পেলাম এবং টাটা ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ব্যাংক হতে (পরে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে একীভূত হয়েছে) চেকখানা ভাঙ্গিয়ে সেই দিনই জামিনের দু'হাজার টাকা কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জমা দিলাম। এবারে ডিক্লারেশন নিলাম আমার নামে। 'নবযুগ' আবার বের হতে লাগল।[৭]

এ যাত্রায়ও *নবযুগ* বেশি দিন টেকেনি। পত্রিকাটি চালানোর ব্যাপারে এ.কে. ফজলুল হক দোদুল্যমান ছিলেন। নজরুলকে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা *নবযুগ* ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করছিলো। অবশেষে ১৯২০ সালের শেষের দিকে ফজলুল হককে না-জানিয়েই তিনি *নবযুগ* ছেড়ে চলে যান। মুজফ্ফর আহ্মদও পরবর্তী সময়ে পত্রিকার ডিক্লারেশন তুলে নেন এবং ফজলুল হক সাহেবের মনোনীত জনৈক সাবির মিঞার নামে গভর্নমেন্ট পেপার স্থানান্তরিত করে *নবযুগ* ত্যাগ করেন। ফলে ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে *নবযুগ* বন্ধ হয়ে যায়। মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন :

> তবুও 'নবযুগ' যদি আমাদের (নজরুল ইসলামের ও আমার) ছাড়তেও হয় তাহলে আমরা ফজলুল হক সাহেবকে সবকিছু বলে-কয়ে, রাজনীতিক কারণ দেখিয়ে এক সঙ্গে ছেড়ে দেব এটাই ছিল কথা। কিন্তু নজরুলের নবলব্ধ সাহিত্যিক বন্ধুদের কয়েকজন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। তাঁদের ভিতরে 'মোসলেম ভারতের' আফ্জালুল হক সাহেবও ছিলেন। তাঁরা কেবলই তাঁকে বলছিলেন যে একজন কবি দৈনিক কাগজে কাজ করবেন এটা কেমন কথা ? কিন্তু 'কবিকেও যে খেতে হয় সেটা তাঁরা ভাবতেন না। তাঁদের প্রত্যেকেই কিন্তু ভাত-কাপড়ের জন্যে কিছু না কিছু করতেন। সাহিত্যিক আড্ডায় মিলিত হতেন ফালতু সময়ে। 'নবযুগে' দুটি কাজ ছিল। একটি ছিল লেখা অন্যটি ছিল সব রকম দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার ভার বহন করা। নজরুলকে শুধু লিখতেই হতো, অন্য কাজটি হতে আমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের অবশ্য দু'টি কাজই করতে হতো। কাজেই, স্বাস্থ্য সত্য সত্যই খারাপ হয়েছিল আমার। নজরুলের সাহিত্যিক ও গানের আড্ডা ছিল। তাতে তাঁর মনটা কিঞ্চিৎ তাজা হতে পারত তবুও নজরুল 'নবযুগ' ছেড়ে গেল। সে যে চলে যাচ্ছে সে কথা অবশ্য সে আমায় বলেছিল। কিন্তু ফজলুল হক সাহেবকে কোনো কথাই সে জানাল না। তার জন্যে আমি মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেম। সাহিত্যিক বন্ধুদের উৎসাহে এতই সে মেতে গিয়েছিল যে আমার স্বাস্থ্যের কথাটাও সে একবার ভেবে দেখল না। অন্যদের সাথে আমিও তাকে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেম। দেওঘরের টিকেট কিনে দেওঘরেই গিয়েছিল। এটা ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা।[৮]

নজরুল ছিলেন একজন অঙ্গীকারবদ্ধ ও দৃঢ়চেতা সাংবাদিক। *নবযুগে* প্রকাশিত তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলোতে সমসাময়িক সমাজ ও যুগচেতনা, দেশাত্মবোধ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধিতা, স্বাধীনতার সংগ্রাম—সর্বোপরি সকল অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন বিশ্বের জাতিসমূহের জাগরণের চিত্রও সাংবাদিক নজরুলের লেখায় ফুটে উঠেছে :

> ... রুশিয়া বলিল মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা বিরোধীর শির। ভাঙ্গো দাসত্বের নিগড়। এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে ... আল্লাহ আকবর বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। তাহার শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্ত রাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। ... আইরিশ উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল যুদ্ধ শেষ হয় নাই ... এ সময় ভারত জাগিল।[৯]

১৯২০ সালের ১২ জুলাই প্রকাশিত *নবযুগ* পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'নবযুগ'-এ বিশ্বব্যাপী পরাধীনতার শৃংখল ভাঙার জন্য বিদ্রোহ-বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিস্বপ্ন অঙ্কিত হয়েছে :

> আজ রক্ত প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব মন নব প্রভাতী ধরিয়াছে— "পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরি।" এ সব নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশরি সুর রুশিরা শুনিয়াছে, আয়ারল্যাণ্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরো অনেকে শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান—জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত-ভারতবর্ষ।[১০]

উল্লেখিত প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে লেখা হয়েছিল :

> এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সর্ব গণ্ডী কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না।[১১]

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে নজরুল তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ চাই' সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করেন। জেনারেল ডায়ারকে উদ্দেশ্য করে তাতে বলা হয়েছিল :

> ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে, তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতে যে কোন প্রান্তর হইতে তাহা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া উঠে। এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ-কসাই এর আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা।[১২]

উপনিবেশবাদ-বিরোধী ভূমিকায় সমকালীন হিন্দু-মুসলমানদের সম্প্রীতির জন্য কবির আকুল আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে নিচের অংশে—

> এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেক দুঃখ ক্লেশ, অনেক ব্যথা বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে, আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই। খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই।[১৩]

সাংবাদিক নজরুলের লেখায় তৎকালীন বাংলার শ্রেণী-সংগ্রামের চিত্রও ফুটে উঠেছিল। তাঁর সহানুভূতি ছিল সর্বহারা কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি। পুঁজিবাদী, সামন্ত মহাজন, কোম্পানি ও আমলা শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তিনি 'ধর্মঘট' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে শ্রেণী বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন :

> চাষী সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙ্গা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দুবেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায় না, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তেনা বা নেংগট ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা জীবনেও ঘটিয়া ওঠে না, ছেলে-মেয়ের শাদ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বার মাসে তেত্রিশ পার্বন করিয়া নওয়াবী চালে দিন কাটাইয়া দেন। কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের বেশী বাঁচেনা

> ... কোম্পানী তো তাহাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছেন ... দেশের সমস্ত কল-কারখানায়, আড়তে গুদামে 'ভাবিয়া চিন্তিয়া মানুষ হত্যার' এইরূপ শত শত বীভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবেন। ... এই বুরোক্রাসি বা আম্‌লাতন্ত্র শাসিত দেশেও তাহারা যখন তাহাদের দুঃখ কষ্ট-জর্জরিত ছিন্ন ভিন্ন অন্তরের এমন বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিল ... এই ধর্মঘটের আগুন এমন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে ... পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং করিবে।[১৪]

নবযুগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ও *ধূমকেতুর* আবির্ভাবের পূর্বে নজরুল দৈনিক *সেবক* ও দৈনিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ পূর্ব থেকে প্রকাশিত হওয়া সাপ্তাহিক *সেবক* দৈনিকে রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালের জুন মাসে তিনি আকরম খাঁর *সেবক* নামক দৈনিকে সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর *সেবক* কবিতাটি এ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বলে আবুল কালাম শামসুদ্দীন উল্লেখ করেছেন। আকরম খাঁ-র 'অগ্রসর' শিরোনামের একটি উত্তপ্ত নিবন্ধ প্রকাশের ফলে *সেবকের* জামানত বাজেয়াপ্ত করে প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। ১০ ডিসেম্বর ১৯২১ সালে মাওলানা কারাবন্দি হন এবং *সেবক*ও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর, যিনি দৈনিক সেবকের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত ছিলেন, প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক *মোহাম্মদীর* দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর ও নজরুলের দৈনিক *মোহাম্মদীতে* যোগদান প্রসঙ্গে বলেছেন :

> ১৯২২ সালের মে কিংবা জুন মাসের কোন সময়ে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এক চিঠি লেখেন আমার কাছে আমার দেশের বাড়ীর ঠিকানায় 'দৈনিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদানের জন্য। আমি বাড়ীতে বেকার বসেছিলাম। আমি আনন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে পরদিনই কলকাতায় গিয়ে কাজে যোগ দিলাম। এর মাসখানেক পরেই সম্ভবত ওয়াজেদ আলী বললেন "নজরুল ইসলাম শুনছি কুমিল্লা থেকে কলকাতায় চলে এসেছে। তাঁকে আমাদের স্টাফে নিয়ে এলে কেমন হয়? আমরা আনন্দে তার প্রস্তাবে সায় দিলাম। সংগে সংগে নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হল। তিনি তখন ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট বংগীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে বাস করছিলেন। তিনি ওয়াজেদ আলীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে পরদিনই এসে দৈনিক মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলেন। দৈনিক মোহাম্মদীতে নজরুল ইসলাম মাসখানেক কর্মরত ছিলেন।[১৫]

মোহাম্মদী পত্রিকায় 'কাতুকুতু' নামে একটি ব্যঙ্গ রসাত্মক কলাম লিখতেন নজরুল। তিনি কবিতার আমেজে কিছুটা ব্যঙ্গ সংবাদের শিরোনাম করে রচনা করতেন। ফলে দৈনিক *মোহাম্মদীর* কাটতি বেড়ে যায়। নজরুল *দৈনিক মোহাম্মদীতে* কাজ করা শুরু করলেও তাঁর লেখা একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলে তিনি দৈনিক *মোহাম্মদী* ত্যাগ করেন। সম্পাদকীয়টি ছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে লেখা। নিবন্ধটি কাটছাট করে ছাপা হলে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হন। এ সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

> ওয়াজেদ মিয়া ফোরম্যানকে ডাকলেন এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রুফ নিয়ে আসতে বললেন তাকে। প্রুফ তার হাতে এসে পৌঁছলে হঠাৎ আমাকে ডাকলেন। বললেন, দেখুন নজরুল সম্পাদকীয়তে কি

লিখেছে। এ লেখা কি করে মাওলানার কাগজে বেরুতে পারে ? আমি দেখলাম, বললাম : লেখাটা কিন্তু খুবই সুন্দর। ওয়াজেদ মিয়া বললেন : সে তো ঠিকই। কিন্তু হিন্দু ভাব ভাষায় লেখা দেখলে মওলানা চটে আগুন হয়ে যাবেন। তার কি করি ? আমি বললাম : তবে এক কাজ করুন। ভাষা কিছু কিছু বদলে দিন। আর যেখানে ভাষার দিক দিয়ে গোলমাল, সেখানে কাঁচিকাটা করুন। কিন্তু তাতে নজরুল চটে যাবে না ? চটবে নিশ্চয়ই। হয়তো সেজন্যে সে আর অফিসমুখোই হবে না।

ভয়তো সেখানেই। উভয় সংকটেই পড়া গেছে। কি যে করি। আমি বললাম : যতটা সম্ভব রেখে এর ভাব ও ভাষার হিন্দুয়ানী চেহারাটা বদলে দিন। তাতে যা হবার হোক। অগত্যা তাই করা হলো। কিন্তু পরদিন কাগজে তাঁর লেখার দুর্গতি দেখে নজরুল যে খুশী হতে পারেন নাই, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। নজরুল সেদিন অফিসে এলেন না। তার পরদিনও না। শুধু তাই নয়, এরপর আর তাঁকে অফিসে কোনদিনই দেখা গেল না।[১৬]

মুজফ্ফর আহ্মদ *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নজরুল *সেবকে* কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯২২ সালের ২৪ জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যুবরণ করলে উপরোল্লিখিত ঘটনাটি ঘটে। দৈনিক *মোহাম্মদী*র কথা যারা বলেছেন সেটি ভুল। কারণ তখন পর্যন্ত *মোহাম্মদী* দৈনিক হিসেবে বের হতো না। পুনঃপ্রকাশিত *সেবকে* কাজ করার সময় এই ঘটনা ঘটেছে বলে আবু হেনা আব্দুল আউয়ালও তার *নজরুলের সাংবাদিকতা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যাই হোক পুনঃপ্রকাশিত *সেবক*-এ নিয়োজিত থাকাকালে চট্টগ্রামের জনৈক হাফিজ মসউদ নজরুলকে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যে অর্থ যোগানদানের প্রস্তাব করলে কবি তাতে রাজি হন। ফলে ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট, বাংলা ১৩২৯ সনের ২৬ শ্রাবণ তিনি *ধূমকেতু* প্রকাশ করেন। খান মুহাম্মদ মইনুদ্দীন এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন :

'নবযুগ' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে নজরুল তাঁর মনের আগুন ছড়িয়ে যেন আরাম পান না—পান না তৃপ্তি। অবহেলিত উৎপীড়িত লাঞ্ছিত জাতি তাঁর মুখের পানে চেয়ে আছে। এটা তিনি অনুভব করছেন। তাই ঘা মেরে এদের জাগাবার সংকল্প নিয়েছেন নজরুল। ব্রত নিয়েছেন। নিজের হাতে কাগজ না থাকলে তো স্বাধীনভাবে কথা বলা যায় না। দুঃসাহসী, লা-পরোয়া নজরুল স্থির করলেন, 'ধূমকেতু' নামে একখানা অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন। কপর্দকশূন্য রিক্ত নিঃসম্বল হলেও তিনি তাঁর ইচ্ছাকে রূপ দিলেন।[১৭]

নজরুল নিজেই ছিলেন *ধূমকেতু*র মালিক, সম্পাদক ও পরিচালক। মুখ্যত তিনি এর পূর্বে সাংবাদিকতা করলেও *ধূমকেতু*ই হচ্ছে তাঁর পত্রিকা পরিচালনার স্বাধীন প্রয়াস। *ধূমকেতু* সপ্তাহে দু-বার বের হতো। এর প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ছিল এক আনা, বার্ষিক ৫ টাকা। এর মোট পৃষ্ঠা ছিল আট, সাইজ ফলিও ১৫″x১০″। এ পত্রিকাটি প্রকাশ উপলক্ষে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি বাণী চেয়ে লিখেছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে পাঠান। কবিতাটি *ধূমকেতু*র প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিটিতে সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপরে মুদ্রিত হতো। রবীন্দ্রনাথের বাণী ছিল নিম্নরূপ :

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দ্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়েয়ে দে তোর বিজয় কেতন
অলক্ষণের তিলক লেখা
রাতের ভালে হোক্‌না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।[১৮]

২৪ শ্রাবণ ১৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশের প্রথম থেকেই *ধূমকেতু* আর্থিক সমস্যায় পড়ে। হাফিজ মসউদ পত্রিকা প্রকাশের জন্য আড়াইশত টাকা দেওয়ার কথা দিলেও তিনি সর্বসাকুল্যে দিয়েছিলেন ২০০ টাকা। কিন্তু কাটতি ভালো হওয়ায় এবং কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যাওয়ায় *ধূমকেতু* প্রকাশ সম্ভব হচ্ছিল। এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নজরুলের *ধূমকেতু* কবিতা প্রকাশিত হয়। *ধূমকেতু*র মধ্য দিয়ে তিনি জনগণের মনে নবজাগরণের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া একেবারে ঠাণ্ডা ও মন্থর হয়ে গিয়েছিল। এরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে তিনি নিশ্চুপ জনতার মাঝে বিপ্লব ও বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। এ ভূমিকার জন্য *ধূমকেতু* প্রকাশের সাথে সাথে বেশ পাঠক-প্রিয়তা লাভ করে। *ধূমকেতু*র প্রথম সম্পাদকীয় 'সারথীর পথের খবর'এ তিনি পত্রিকার ভূমিকা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন :

> ... আমার কর্ণধার আমি। আমার যাত্রা শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি নমস্কার করছি আমার সত্যকে। ... দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী। ... 'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্যধর্মই সবচে বড় ধর্ম। হিন্দু মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ্ দূর কর্‌া এর অন্যতম উদ্দেশ্য।[১৯]

ধূমকেতু পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও আধেয় সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন :

> সপ্তাহান্তে বিকাল বেলা আরো অনেকের সংগে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে ধূমকেতুর বাণ্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্য। কালির বদলে রক্ত ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ... যেমন গদ্য তেমন কবিতা। সব ভাঙ্গার গান প্রলয়বিলয়ের মঙ্গলাচরণ।[২০]

*ধূমকেতু*তে তিনি স্বাধীন ও নির্ভীক সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি রাজনীতি-চর্চা করেছেন, সামাজিক কুসংস্কার, শোষণ, নিপীড়ন নির্যাতন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করেছেন। সাংবাদিক নজরুল *ধূমকেতুতে* ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেন। এটাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রথম দাবি। ১৯২২ সালের ১৩ অক্টোবর *ধূমকেতুতে* প্রকাশিত 'ধূমকেতুর পথ' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে নজরুল লেখেন :

> সর্বপ্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।
>
> স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মাশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদেরো এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।
>
> পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।
>
> আর এই বিদ্রোহ করতে হলে—সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে,
>
> আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!
>
> বলতে হবে,—
>
> যে যায় যাক সে, আমার হয়নি লয়।[২১]

ধূমকেতুতে নজরুলের স্বাধীনতা দাবি প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন :

> অনেকে হয়তো নিজেদের বৈঠকখানায় বসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিংবা হয়তো গোপন ইশ্‌তিহার ছেপে তার মারফতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু এমন স্বার্থহীন, চাঁছা-ছোলা ভাষায় খবরের কাগজে ঘোষণা করে বাঙলা দেশে নজরুলের মতো আর কে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে তুলে ধরেছিলেন তা আমার জানা নেই।[২২]

নজরুলের সাংবাদিকতার ধরন ছিল গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে। তিনি অনেক সময় কবিতায় সম্পাদকীয় রচনা করতেন। খবরের শেষেও তিনি কখনো কখনো কবিতার চরণ উদ্ধৃত করতেন রচনাকে ফলপ্রসূ করার জন্যে। খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিন লিখেছেন :

> 'ধূমকেতু'তে তিনি লিখেছিলেন 'আগমনী' কবিতা। কিন্তু তা 'ধূমকেতু'তে বাহির হয়েছিল সম্পাদকীয়রূপে। নজরুল তা-ই করতেন। অনেক সম্পাদকীয় তিনি ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেই লিখতেন। আর সংবাদ শেষেও দু' এক লাইন কবিতা দিয়ে সংবাদটিকে রসালো করে তুলতেন। 'নবযুগে'ও এমনি হতো।[২৩]

ধূমকেতু ও *গণবাণী* পত্রিকায় নজরুল যে সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলোর মধ্যে ছিল রুদ্রমঙ্গল, মোহর্‌রম, বিষ-বাণী, ধূমকেতুর পথ, মন্দির ও মসজিদ, হিন্দু-মুসলমান, মোরা সবাই স্বাধীন—মোরা সবাই রাজা, ম্যাঁয় ভুখা হুঁ, আমি সৈনিক ইত্যাদি। উল্লেখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্যে 'মন্দির ও মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক নিবন্ধদ্বয় যথাক্রমে ১৯২৬ সালের ২৬ আগস্ট ও ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে *গণবাণী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অন্যান্য নিবন্ধ প্রকাশিত হয় *ধূমকেতুতে*। *ধূমকেতুর* প্রথম সংখ্যায় (১১ আগস্ট ১৯২২) সারথির পথের খবর, ৩য় সংখ্যায় (১৮ আগস্ট ১৯২২) রুদ্র মঙ্গল, ৪র্থ সংখ্যায় (২২ আগস্ট ১৯২২) মোরা সবাই স্বাধীন—মোরা সবাই রাজা, ৭ম সংখ্যায় (১৩৪১ হিজরী সালের মোহররম সংখ্যায়, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২২) 'মোহররম', ৮ম সংখ্যায় (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২২) বিষ-বাণী, ৯ম সংখ্যায় (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২২) ম্যাঁয় ভুখা-হুঁ, ১৩শ সংখ্যায় (১৩ অক্টোবর ১৯২২) ধূমকেতুর পথ, ১৮শ সংখ্যায় (৩১ অক্টোবর ১৯২২) আমি সৈনিক এবং ৩২তম সংখ্যায় (২৭ জানুয়ারি ১৯২৩) রাজবন্দীর জবানবন্দী শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। *ধূমকেতু* ও *গণবাণীতে* প্রকাশিত তাঁর কতগুলো সম্পাদকীয় নিবন্ধ নিয়ে পরবর্তীকালে *রুদ্রমঙ্গল* ও *দুর্দিনের যাত্রী* নামে দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয়ের পাশাপাশি *ধূমকেতুর* খবরগুলো তিনি নিজ হাতে লিখতেন। অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে সংবাদ লিখতেন এবং আকর্ষণীয় শিরোনাম প্রদান করতেন। তাঁর সংবাদ জ্ঞান ও প্রতিবেদন রচনার কাঠামো প্রসঙ্গে মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর লিখেছেন :

> সাংবাদিকতায় নজরুলের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। 'নবযুগ' পত্রিকাতে তাঁর হাতে খড়ি। তাও সামান্য কদিন কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপরই 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে নজরুল যে সংবাদ জ্ঞানের (নিউজ সেন্সের) পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর দেয়া শিরোনাম দেখেই যে কোন পাঠক সংবাদের দিকে আকৃষ্ট হবেন। শিরোনামগুলি ঠিক চলতি ধরনের নয়, এইগুলির বৈশিষ্ট্য পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। কোন কোন সংবাদের সাব হেডিং বা উপ শিরোনাম কখনো কবিতায় কখনো গদ্যে রচিত। তারপর মূল সংবাদ কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশিত। হেডলাইনের মধ্যে মোদ্দাকথা বলে সংক্ষেপে খবর পরিবশেনা আধুনিক সাংবাদিকতা। নজরুল সেযুগেই এই রীতি চালু করেছিলেন।[২৪]

ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য নজরুল এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর তিনি কারামুক্ত হন। ১৯২২ সালের ৭ নভেম্বর অর্থাৎ ২০শ সংখ্যা পর্যন্ত তিনি *ধূমকেতু* সম্পাদনা করেন। উল্লেখ্য যে ৫ মাস ১৬দিন সময়ে *ধূমকেতুর* মোট ৩২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৭ জানুয়ারি। পত্রিকাটি ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে আফজালুল হক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো এবং ছাপা হতো ৭নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা মেটকাফ প্রেস থেকে। পরবর্তীকালে নজরুল শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র *লাঙ্গল* পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকাটি ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। আতাউর রহমান মুজফ্‌ফর আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে "নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন "১৯৫২ সালের শেষ

দিকে কলকাতায় একটি পার্টি গঠিত হয়। নজরুল ইসলাম, শ্রী হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবুদ্দিন আহমদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন এই পার্টি গড়ার কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পার্টির নাম প্রথমে ছিল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের) অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি (The Labour Swaraj party of the Indian National Congress)। এই পার্টির মুখপত্র লাঙ্গল পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।"[২৫] অন্যদিকে প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। *লাঙ্গল* পত্রিকায় নজরুলের যোগদান প্রসঙ্গে খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন লিখেছেন :

> ১৩৩২ সালের ১লা পৌষ (১৬-১২-১৯২৫) কোলকাতা থেকে 'লাঙল' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার হলো। এর অফিস ছিল মির্জাপুর স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের জংশনে—৩৭নং হ্যারিসন রোড, কোলকাতা, দোতালার ওপরে। অধুনা বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন : কমরেড শামসুদ্দীন আহ্মদ, কমরেড আবদুল হালিম, কমরেড সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আরো অনেকে।
>
> কৃষ্ণনগরে গিয়েও নজরুলের খুবই আর্থিক দুর্গতি চলছিল। শুধু পত্র-পত্রিকায় লিখে তাঁকে ব্যয়বহুল সংসার প্রতিপালন করতে হতো। অর্থ কষ্ট কিছুটা দূরীকরণের ইচ্ছায় মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব নজরুলকে 'লাঙল' পরিচালনার ভার দিলেন। সম্পাদক হলেন শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এর প্রথম সংখ্যায়ই কবির বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হলো।[২৬]

কবি ঘোষণা করলেন :

> গাহি সাম্যের গান
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
> যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান
> গাহি সাম্যের গান।[২৭]

লাঙ্গল বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। মোট ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর ১৫ এপ্রিল ১৯২৬এর পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১২ আগস্ট ১৯২৬ এবং ২৭ শ্রাবণ ১৩৩৩ তারিখে *লাঙ্গল গণবাণী* নামে প্রকাশিত হয়। তখন সম্পাদক ছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। *গণবাণী*তে লেখা থাকত এর সাথে *লাঙ্গল* একীভূত হয়েছে। ঢাকার নজরুল ইনস্টিটিউটে রক্ষিত *গণবাণীর* পুরনো সংখ্যাগুলো অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, যে ১৯২৭, ২২ শ্রাবণ ১৩৩৪ পর্যন্ত অর্থাৎ *গণবাণীর* ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত এ কথাটি *গণবাণীর* প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। *গণবাণী*তেও নজরুল সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেন। এ পত্রিকায় তাঁর গান, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'নজরুল ইসলাম ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ১৯২৬ সালে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে নজরুল ২৬ আগস্ট *গণবাণী*তে 'মন্দির ও মসজিদ' এবং ২ সেপ্টেম্বর 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন।

'মন্দির ও মসজিদ' নিবন্ধে তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্ণনা প্রদান করেন।

> 'মারো শালা যবনদের', "মারো শালা কাফেরদের", আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং কালীর প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, "বাবা গো, মা গো!" মাতৃপরিত্যক্ত দুটি ভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া মাকে ডাকে। দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির কলঙ্কিত হইয়া রহিল।[২৮]

'হিন্দু-মুসলমান' নিবন্ধে নজরুল উল্লেখ করেন :

> হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের টিকিত্ব, দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাঁধায়, টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই ত্ব মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়।
>
> অবতার পয়গাম্বর কেউ বলেনি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমি মানুষের জন্য এসেছি—আলোর মত সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তরা বলেন, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহাম্মদের ভক্তরা বললে মুহাম্মদ মুসলমানদের, খ্রীষ্ট শিষ্যেরা বললে, খ্রীষ্ট খ্রীশ্চানদের, কৃষ্ণ-মুহাম্মদ-খ্রীষ্ট হয়ে উঠলে জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তি নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু ছাগল নিয়ে করে।[২৯]

এভাবে তিনি সাংবাদিকতার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার বিরোধের বিষয়গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আহ্বান জানিয়েছেন মানবতাবাদের দিকে। অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করেছেন ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে উদার মানবতার উচ্চাদর্শে আলোকিত হতে।

১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে *মোসলেম ভারত* বন্ধ হয়ে গেলে এর পরিচালক মোহাম্মদ আফজালুল হক ১৩৩৪ (১৯২৭ সালের জুন/জুলাই) সালের আষাঢ় মাসে মাসিক *নওরোজ* পত্রিকা বের করেন। নজরুল তখন এ-পত্রিকার সাথে মাসে ১০০-১৫০ টাকার বিনিময়ে তার সমস্ত লেখা প্রকাশের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেছেন নজরুল *নওরোজে* সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। এ পত্রিকাটিও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশের পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ফজলুল হক আবার *নবযুগ* প্রকাশ করেন। তখন আবুল মনসুর আহমদ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর নাম প্রকাশে অনীহা প্রকাশ করে নজরুলকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ

করেছিলেন। এ পর্বে তাঁর অর্থনৈতিক দুর্দিন চলছিল। আবুল মনসুর আহ্মদ নজরুলের দারিদ্র্য ও *নবযুগের* সম্পাদনার ভার গ্রহণ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> কাজী সাহেব এই সময় দায় দেনায় খুবই বিপন্ন ছিলেন। পাওনাদাররা ডিক্রিজারি করিয়া তাঁকে অপমান করিবার চেষ্টা করিতেছে। পক্ষান্তরে তাঁর পাবলিশার ও গ্রামোফোন কোম্পানীরা তাঁকে ঠকাইতেছে। এই সময়ে কাজী সাহেবকে আর্থিক সাহায্য করাও হইবে। আমরা সাড়ে তিনশ' টাকা বেতন অফার করিলাম। কিছু করিতে হইবে না, মাঝে মাঝে বিকাল বেলা অফিসে আড্ডা এবং সপ্তাহে এক আধটা কবিতা দিলেই যথেষ্ট। কাজী সাহেব রাজী হইলেন। ধুমধামের সহিত 'নবযুগ' বাহির হইল।[৩০]

কবি এই সময় প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলে দলে দলে মুসলিম তরুণরা কবিকে দেখতে *নবযুগ* অফিসে আসা শুরু করে। পরের ঘটনা অন্যরকম। তখন তাঁর মস্তিষ্কের অসুস্থতা দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম *নজরুল জীবনীতে* লিখেছেন—"নজরুল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে অসুস্থ হন। তিনি তখন এ কে ফজলুল হকের দৈনিক নবযুগ (নব পর্যায়) পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।"[৩১] ১৯৪২ সালের ২ জুন তারিখে নজরুল নব পর্যায়ের *নবযুগের* জন্য 'আমার সুন্দর' সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন। এর পরেই তিনি অসুস্থ হন। তাই 'আমার সুন্দর'ই তাঁর লেখা শেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

> কবি নজরুলের সাংবাদিকতা জীবনের ভিত্তি ছিল দেশপ্রেম। পরাধীন ভারতবর্ষের গ্লানি তৎকালীন শাসক শ্রেণীর ঘৃণ্য অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সাংবাদিক হিসেবে সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সাংবাদিক নজরুলের জীবনকে স্পষ্টভাবে তিনটি রাজনৈতিক ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা যে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়েছে তারও একটা পরিচয় মেলে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার সুর দেখে। যেমন প্রথম যৌবনে তিনি যখন 'নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন তখন তিনি পুরোপুরি বিদ্রোহী। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই ছিল তখন তার রাজনৈতিক ভূমিকা। এরপর নজরুল যখনি 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন তিনি ক্রমশঃ বিপ্লবী হয়ে উঠেছেন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা এক ধাপ উত্তীর্ণ হয়েছে। এরপর নজরুল যখন লাঙল, গণবাণী প্রকাশ করেন তখন তাঁকে পুরোপুরি সাম্যবাদী বলা চলে। কৃষক শ্রমিকের মুক্তির জন্য তাঁর লেখনী তখন সোচ্চার। মাঝখানে বেশ কবছরের বিরতির পর যখন নব পর্যায়ে প্রকাশিত নবযুগের সাথে তিনি জড়িত হলেন তখন জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় নজরুল উদ্বুদ্ধ।[৩২]

আলোচিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখায় সাংবাদিক নজরুলের স্বদেশী ও আন্তর্জাতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় মেলে এগুলোতে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধসমূহের ছিল তাৎক্ষণিক, সমসাময়িক মূল্য। তাই নজরুলের অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মত নিবন্ধসমূহ কলোত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাঁর সম্পাদকীয় রচনার স্টাইল কিংবা কাব্যিক শিরোনাম—কোনটিই পরবর্তীকালের সাংবাদিকতায় প্রভাব ফেলেনি। এমনকি তাঁর মত নির্ভীক ও সাহসী সাংবাদিকও পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়নি। সাহসিকতার জন্য তাঁকে মূল্যও দিতে হয়েছে প্রচুর। মূলত সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন

সবরকম ভেজাল, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে গণজাগরণ ও প্রতিবাদের চেতনা সৃষ্টি করতে।

তথ্যনির্দেশ

১. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, মুক্তধারা, ১৯৭৩, পৃ. ৬০-৬১

২. কাজী নজরুল ইসলাম, *যুগবাণী*, তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন।

৩. *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* , পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৪. *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

৫. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য*, কে.পি.বাগচী এণ্ড কোং, কলকাতা,১৯৯৯, পৃ. ৪৭

৬. 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে'?, *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৬

৭. *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

৮. *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪

৯. 'ধর্মঘট', নবযুগ, *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৬, পৃ. ৬১২

১০. 'নবযুগ', *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১১

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৩-৬১৪

১২. 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৮

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২১

১৪. 'ধর্মঘট', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২১

১৫. আবুল কালাম শামসুদ্দীন,*নজরুল একাডেমী পত্রিকা*, নজরুল স্মারক সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ১৬৩

১৬. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, ১৯৬৮, পৃ. ২৩

১৭. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, *যুগস্রষ্টা নজরুল*, ১৯৭৮, পৃ. ২৩

১৮. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৮৮-৮৯

১৯. 'আমার পথ', *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৮

২০. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, কলকাতা, সপ্তম প্রকাশ : ১৩৯৫, পৃ. ২৭

২১. 'ধূমকেতু'র পথ, *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৭

২২. *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২-৪৩

২৩. *যুগস্রষ্টা নজরুল* , পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

২৪. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, 'কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন', *গবেষণাপত্র*, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ১৯

২৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *নজরুল সমীক্ষণ*, নজরুল ইনস্টিটউট, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২১

২৬. *যুগস্রষ্টা নজরুল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০-৭১

২৭. *লাঙ্গল*, ২৫ ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯২৫

২৮. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *নজরুল সমীক্ষণ*, নজরুল ইনসটিটিউট, ১৯৯৯

২৯. পূর্বোক্ত

৩০. আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, ১৯৭৮, পৃ. ৩৫৬

৩১. রফিকুল ইসলাম, *নজরুল জীবনী*, ১৯৭২, পৃ. ৫৮২

৩২. 'কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২